৮. পুষ্যভূতি বংশ

(ক) প্রাচীন ইতিহাস ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তরভারতে যে আঞ্চলিক শক্তিগুলির অভ্যুত্থান ঘটে তার মধ্যে অন্যতম বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চলে প্রাচীন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ। সম্ভবত গুপ্তরাজদের সামন্ত হিসাবে জীবন শুরু করে পুষ্যভূতি বংশীয়গণ হুণ আক্রমণ প্রতিহত করে, গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনজনিত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। পুষ্যভূতিদের প্রথম দিককার লেখ ও সীলমোহর থেকে চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন নরবর্ধন, আদিত্যবর্ধন, প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন। নরবর্ধন সম্ভবত খ্রীঃপঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ায় রাজত্ব করেছেন। আদিত্যবর্ধন পরবর্তী গুপ্তরাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। প্রভাকরবর্ধন সাফল্যের সঙ্গে হুণ আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি মালব ও গুজরাত জয় করেন। কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়ে তিনি থানেশ্বরের রাজনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করেন। পুষ্যভূতি বংশে তিনিই প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' ও 'পরমভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করেন।

নরবর্ধন, আদিত্যবর্ধন, প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন

(খ) রাজ্যবর্ধন (আনুমানিক ৬০৫-৬০৬ খ্রীঃ) ঃ ৬০৫ খ্রীঃ-এ জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন হুণ আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যস্ত থাকাকালীন প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়। সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের যৌথ আক্রমণে তাঁর ভগ্নীপতি কনৌজের গ্রহবর্মনের মৃত্যুসংবাদ পান। তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রীও বন্দী হন। রাজ্যবর্ধন দ্রুত কনৌজের উদ্দেশে রওনা হয়ে দেবগুপ্তকে পরাস্ত করে ভগ্নীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু শশাঙ্কের হাতে তিনি নিহত হন। এই রকম এক বেদনাময় পরিস্থিতিতে ৬০৬ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(গ) হর্ষবর্ধন (আনুমানিক ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) ঃ কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের হত্যাকাণ্ডের পর কনৌজের সিংহাসন শূন্য হলে সেখানকার অমাত্যদের অনুরোধক্রমে হর্ষবর্ধন কনৌজকে থানেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করেন। অপর মতো হল গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সুরসেন কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শশাঙ্কের পক্ষে ছিলেন। শশাঙ্ক সম্ভবত সুরসেনকে সিংহাসনে স্থাপন করে কনৌজ পরিত্যাগ করলে হর্ষবর্ধন সুরসেনকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। তিনি প্রথমে তাঁর বিধবা ভগ্নী রাজ্যশ্রীর প্রতিনিধি হিসাবে যুবরাজ শিলাদিত্য নামে কনৌজের রাজকার্য পরিচালনা করতেন। প্রায় ছ'বছর পরে আনুমানিক ৬১২ খ্রীঃ-এ ক্ষমতা সুদৃঢ় হলে তিনি

ভগ্নীকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহত রাজ্যবর্ধন

Scanned with CamScanner

নিজেকে কনৌজের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। এক চরম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজ দুটি রাজ্যেরই শাসনভার গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধন কনৌজকেই তাঁর রাজধানী হিসাবে বেছে নেন। বিভিন্ন ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে পাটলিপুত্রের গুরুত্ব হ্রাস পেলে কনৌজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কনৌজ ক্রমে সর্বভারতীয় মর্যাদার অধিকারী হয়। কিছু দিনের মধ্যেই সংঘটিত পশ্চিমের প্রতিহার, পূর্বের পাল ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট শক্তিত্রয়ের কনৌজ জয়ের জন্য ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সিংহাসনারোহণ নিয়ে বিতর্ক

ঐতিহাসিক উপাদান

হর্ষবর্ধন সম্পর্কে প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান তাঁর সভাকবি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত। উভয় লেখকই হর্ষবর্ধনকে দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা, সাহিত্য-শিল্প ও ধর্মে অনুরাগী এক মহান শাসক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ যুগের কিছু শিলালিপিও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঁশখেরা তাম্রপট্ট, নালন্দা সীল, সোনাপৎ তাম্রপট্ট, মধুবনী তাম্রপট্ট ও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি।

বাণভট্ট, হিউয়েন সাঙ

শিলালিপি

রাজ্যবিস্তার

আইহোল লিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই অভিধার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হলে তাঁর রাজ্যবিস্তার নীতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গুপ্ত রাজকন্যার পৌত্র হিসেবে হর্ষবর্ধনের স্বপ্ন ছিল যে তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে এক রাজছত্রতলে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের ঐক্যসাধন করবেন। তাই তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। রোমিলা থাপার এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, গুপ্ত শাসনকালে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল হর্ষবর্ধনের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়।

'সকলোত্তরপথনাথ'

হর্ষবর্ধন প্রথমেই শশাঙ্ক বিরোধিতায় লিপ্ত হন। হর্ষচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি প্রথমেই বিপন্না ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে গৌড়ের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বৌদ্ধ গ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বলা হয়েছে তিনি কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে শশাঙ্ককে কার্যত বন্দী করে রাখেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বৌদ্ধগ্রন্থটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ এটি অনেক পরবর্তীকালের রচনা ও বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে প্রায়শই শশাঙ্ক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, শশাঙ্ক অন্ততপক্ষে ৬১৯খ্রীঃ পর্যন্ত এমনকি তার পরেও রাজত্ব করেন। অতএব শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের অভিযান কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য অধিকার করেন। ৬২৯ খ্রীঃ-এ শশাঙ্ক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পরিত্যাগ করেন। উড়িষ্যার গঞ্জামের ওপর তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। তাঁর স্বর্ণমুদ্রার মানেরও অবনতি ঘটে। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীঃ-এ শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মতের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন ৬৩৭ খ্রীঃ-এ হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধগয়া পরিদর্শনে গিয়ে শুনেছিলেন যে সম্প্রতি শশাঙ্ক সেখানে বোধিবৃক্ষের ক্ষতিসাধন করেছেন। ৬১৯ খ্রীঃ ও তার দীর্ঘকাল পরেও গৌড়, মগধ, বুদ্ধগয়া, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে শশাঙ্ক সগৌরবে রাজত্ব করেছেন। হর্ষবর্ধন এই অঞ্চলগুলি সম্ভবত ৬৩৭ খ্রীঃ-এ শশাঙ্কের

গৌড় অভিযান

হর্ষবর্ধন-শশাঙ্ক দ্বন্দ্ব

Scanned with CamScanner

মৃত্যুর পর অধিকার করেন। ভাগিরথী ও পদ্মার পূর্বদিকের অঞ্চল ভাস্করবর্মন দখল করেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে বলা হয়েছে, ক্রমাগত ছ'বছর যুদ্ধ করে হর্ষবর্ধন 'পঞ্চভারত' জয় করেন, অর্থাৎ পাঞ্জাব, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা ও কলিঙ্গ। কিন্তু অন্য কোনো সূত্র থেকে এ তথ্য সমর্থিত হয়নি। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের পর হর্ষবর্ধন সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের মৈত্রকরাজ ধ্রুবসেনকে পরাস্ত করে বলভীরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু ধ্রুবসেন তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে হর্ষবর্ধন নিজকন্যার সঙ্গে বলভীরাজের বিবাহ দিয়ে তাঁকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অধিকার দেন। বলভী হর্ষবর্ধনের মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এছাড়া আনন্দপুর, কচ্ছ, দক্ষিণ কাথিয়াওয়াড় হর্ষবর্ধনের প্রভাবধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের সিন্ধু অভিযানের কথা বলা হলেও হিউয়েন সাঙ তাকে স্বাধীন দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের তুষারশৈল অভিযানের উল্লেখ আছে। এর দ্বারা কেউ নেপাল ও কাশ্মীরকে বুঝিয়েছেন, কেউ আবার বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের মতো পর্বতীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'পঞ্চভারত'

বলভীরাজের সঙ্গে মৈত্রী

সিন্ধু ও তুষারশৈল অভিযান

হর্ষবর্ধন যখন উত্তরভারতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত সেই সময়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন। নর্মদার উত্তরে রাজপুতানা ও গুজরাট পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তৃত হলে তা চালুক্য সীমান্তকে স্পর্শ করে। হর্ষবর্ধন ও পুলকেশীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৬৩৪ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধন চালুক্যরাজের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে দক্ষিণভারত বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

হর্ষবর্ধন-পুলকেশী দ্বন্দ্ব

চালুক্যদের আইহোল লিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কে. এম. পানিক্কর বলেছেন, বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরদিকের সবদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাধাকুমুদ মুখার্জি মন্তব্য করেছেন, সব সম্ভাব্য দিক বিচার করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরভারতের সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এ অভিমত মানেন না। তিনি মনে করেন হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা সম্পর্কে বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। প্রকৃত রাজ্যসীমা এই ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। *প্রথমত*, হর্ষবর্ধন উত্তরাধিকার সূত্রে থানেশ্বর ও পূর্ব পাঞ্জাব লাভ করেন। *দ্বিতীয়ত*, ভগ্নীর সূত্রে তিনি কনৌজ, দোয়াব ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করেন। *তৃতীয়ত*, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি মগধ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম অধিকার করেন। বাণভট্ট বর্ণিত পঞ্চভারতের সঙ্গে এই রাজ্যসীমা সঙ্গতিপূর্ণ। এই অঞ্চলগুলির ওপর তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ আছে। এই পরিসীমার বাইরে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, নেপাল, কাশ্মীর, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের মতো অঞ্চল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে তাঁর কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে 'সকলোত্তরপথনাথ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় যে হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরভারতকে সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ না হলেও সেখানকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর প্রভাবাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা সমুদ্রগুপ্তের মত বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে অসমর্থ হলেও গুপ্তোত্তর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে ও হুণ আক্রমণের কালে তিনি কিছুকাল অন্তত উত্তরভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

'সকলোত্তরপথনাথ' অভিধা অতিরঞ্জিত

উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন

Scanned with CamScanner

ভারত-চীন সম্পর্ক

হর্ষবর্ধনের শাসনকালে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। তাঙ্‌বংশীয় রাজাদের শাসনকালে বহু চীনা ভিক্ষু ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ অন্যতম। তাঁর কাছ থেকেই সম্ভবত হর্ষবর্ধন চীনদেশ সম্পর্কে অবহিত হন। মা-তোয়ান-লিন নামে চীনা ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধনের শাসনকালে চীন-ভারত সম্পর্কের কথা লিখে গেছেন। ৬৪১ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধন চীনাসম্রাট তাই সুঙের কাছে দূত প্রেরণ করলে চীনা সম্রাটও প্রত্যুত্তরে হর্ষবর্ধনের রাজ্যসভায় দূত পাঠান। চীনা দূতের সনদ হর্ষবর্ধন যথোচিত মর্যাদায় গ্রহণ করেন। চীনা ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে হর্ষবর্ধনের আত্মসমর্পণ হিসাবে বর্ণনা করলেও মনে করা হয় যে দূত বিনিময় ছিল কূটনৈতিক শিষ্টাচারের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ। ৬৪৩ খ্রীঃ-এ লি-ই-পিয়াও ও ওয়াং-হিউয়েন-সের নেতৃত্বে অপর একটি দল কনৌজে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। হিউয়েন সাঙের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনা সম্রাটদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৬৪৭ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর অপর এক চীনা দৌত্য ভারত পরিভ্রমণে এসেছিল। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী কোনো এক অযোগ্য ব্যক্তি কনৌজের সিংহাসনে হর্ষবর্ধনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। চীনা দূত বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা সংগ্রহ করে কনৌজরাজকে পরাস্ত করেন ও বন্দী করে চীনদেশে নিয়ে যান। এই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অবশ্য অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তবে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চীনা ভিক্ষু ও পর্যটকদের ভারত ভ্রমণ

চীনা সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়

শাসনব্যবস্থা

মৌর্য ও গুপ্ত শাসনব্যবস্থার ধারা হর্ষবর্ধনের সময়েও অব্যাহত ছিল। রাজকীয় আমলাদের ওপর নির্ভর না করে হর্ষবর্ধন ব্যক্তিগত ভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থার তদারকী করতেন। প্রজাদের সঙ্গে গণসংযোগ স্থাপন ও তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মিত শহর ও গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণে বের হতেন।

প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ

একটি মন্ত্রীপরিষদ রাজকার্য পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করত। বিশেষ করে যুদ্ধ, বিদ্রোহ বা কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মন্ত্রীপরিষদ রাজাকে পরামর্শ দিত। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শেই রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও রাজ্যবর্ধনের অকালমৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাছাড়া বহু পদস্থ আমলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত ছিল। অবন্তি ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, সিংহনাদ প্রধান সেনাপতি ও কুন্তল ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। এ ছাড়া ছিলেন মহারাজা, রাজস্থানীয়, মহাসামন্ত, বিষয়পতি, উপরিক প্রভৃতি পদস্থ আমলা। কুমারামাত্যরা ছিলেন প্রভাবশালী আমলা। এদের মধ্যে থেকেই সচিব ও জেলা পর্যায়ের আমলারা নিযুক্ত হতেন। পুস্তপাল বা পুস্তকারিত ও করণিক ছিল নীচু স্তরের রাজকর্মচারী। জমিসংক্রান্ত দলিল ও অন্যবিধ নথিপত্র তারা সংরক্ষণ করত। হর্ষবর্ধন রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করতেন।

মন্ত্রীপরিষদ

সুবিশাল আমলাতন্ত্র

হর্ষবর্ধন তাঁর সাম্রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশ বা ভুক্তিতে ভাগ করেন। প্রদেশগুলি একাধিক জেলা বা বিষয়ে বিভক্ত ছিল। লোকপাল প্রাদেশিক ও বিষয়পতি জেলা স্তরের সর্বোচ্চ আমলা ছিলেন। সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত ছিল গ্রামিকের হাতে। করণিকের সাহায্যে তিনি গ্রামশাসনের দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রশাসনিক বিভাজন

পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হস্তীবাহিনীর সমন্বয়ে হর্ষবর্ধনের সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অশ্ব পারস্য, সিন্ধু ও কম্বোজ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা

সামরিক বাহিনী

Scanned with CamScanner

হত। অশ্বারোহী বাহিনীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিল কুন্তল, অন্যান্যদের বলা হত বৃহদশ্বর। বলাধিকৃত ও মহাবলাধিকৃত ছিল পদাতিক বাহিনীর উচ্চপদাধিকারী। সাধারণ সেনাদের বলা হত চত ও ভট। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত অনুযায়ী হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনীতে ঊনষাট হাজার হস্তী ও এক লক্ষ অশ্ব ছিল। সংখ্যাগুলি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। সব শ্রেণীর সেনাপতি ও পদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পদ ভোগ করত। বেতনের পরিবর্তে তাদের ভূমিদান করা হত।

দণ্ডবিধি

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যে কঠোর দণ্ডবিধি বলবৎ ছিল। অপরাধীদের অঙ্গচ্ছেদ, নির্বাসন, জরিমানা ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণদণ্ডের মত শাস্তি দেওয়া হত। অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্য আগুন, জল ও তুলাদণ্ডের মত দৈব পরীক্ষারও আশ্রয় নেওয়া হত। কঠোর দণ্ডবিধি সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না। স্বয়ং হর্ষবর্ধনের দুবার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, হিউয়েন সাঙ একাধিকবার দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন।

কর ও শুল্ক

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিন প্রকার কর আদায় করা হত। এগুলি হল ভাগ, হিরণ্য ও বলি। ভাগ ছিল ভূমিরাজস্ব, যা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ হারে শস্যে আদায় করা হত। হিরণ্য ছিল বণিকদের প্রদত্ত শুল্ক। আপৎকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বলি আদায় করা হত। কখনও কখনও কৃষকরা রাজস্বের পরিবর্তে শ্রমদান করত। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধন সংগৃহীত রাজস্বকে চারটি ক্ষেত্রে ব্যয় করতেন—রাজ্যশাসন, রাজকর্মচারীদের বেতন ও ভরণপোষণ, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বৃত্তিপ্রদান এবং ধর্মীয়দান। এছাড়াও পথ-ঘাট নির্মাণ, সেচ, বিধবা ও অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রচুর অর্থব্যয় হত।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও তার মধ্যে বিকেন্দ্রিকরণের প্রবণতা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশি। এর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণগুলি ক্রমশ ফুটে ওঠে। পদস্থ রাজকর্মচারী ও ব্রাহ্মণদের অত্যধিক হারে ভূমিদানের ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পথ সুগম হয়। প্রদেশ ও জেলা স্তরের প্রশাসনিক পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধনের বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকাংশই সামন্তরাজদের কাছ থেকে সংগৃহীত। ফলে সামরিক দিক থেকে তিনি সামন্তবর্গের ওপর পুরো মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসকরাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কেন্দ্রীয় শাসকের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকত না। গ্রামশাসনে কেন্দ্রীয় নীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে স্থানীয় সুবিধা-অসুবিধাকেই বড় করে দেখা হত। ক্রমাগত ভূমিদানের ফলে, যা অগ্রহার ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল, রাজার ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর সাম্রাজ্য সর্বভারতীয় চরিত্র পরিগ্রহ করতে না পারায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাণিজ্যের বিকাশ সম্ভব হয়নি। তবে উত্তরভারতের গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের মতো সমৃদ্ধ অঞ্চলটি সাম্রাজ্যের অধিকারে থাকায় হর্ষবর্ধনের শাসনকালে প্রজাসাধারণ মোটামুটি সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করেছে।

সামন্ত রাজাদের প্রাধান্য

অগ্রহার ব্যবস্থা

ধর্মীয় বিশ্বাস

পুষ্যভূতি বংশীয় নৃপতিগণ প্রধানত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। হর্ষবর্ধন নিজে শিব ও সূর্যসহ সব হিন্দুদেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু রাজত্বের শেষপর্বে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পরিবর্তনের পেছনে হিউয়েন সাঙ ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত অনুযায়ী তিনি

Scanned with CamScanner

রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন ও বহু বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকরা মনে করেন হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখালেও শিব ও সূর্যের উপাসনায় অবহেলা দেখান নি। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত থেকেই জানা যায় সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম তার জনপ্রিয়তা হারায়, জৈন ধর্মের প্রভাব পূর্ব ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক কিন্তু হর্ষবর্ধন সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শিব ও সূর্যের উপাসক

মহাযান বৌদ্ধমতবাদের অনুরাগী

৬৪২ খ্রীঃ-এ হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিশাল ধর্মসভা আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বীদের দ্বন্দ্ব নিরসন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বৌদ্ধ পণ্ডিত এই সভায় যোগ দেন। এছাড়া বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, জৈন সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক সভায় অংশ নেয়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন ও বলভীরাজ ধ্রুবসেন সহ মোট কুড়িজন নৃপতি ও সামন্তরাজ এখানে উপস্থিত হন। স্বয়ং হিউয়েন সাঙ ছিলেন কনৌজের মহাধর্মসভার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ধর্মসভা উপলক্ষে গঙ্গাতীরে একশো হাত উচ্চতাবিশিষ্ট এক মন্দির নির্মিত হয়। গৌতম বুদ্ধের এক স্বর্ণমূর্তি ছিল এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। প্রতিদিন প্রাতঃকালে অপর একটি বুদ্ধমূর্তি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হত। হর্ষবর্ধন, তাঁর মিত্র রাজন্যবর্গ ও অসংখ্য বুদ্ধঅনুরাগীসহ শোভাযাত্রাটি নবনির্মিত বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে শেষ হত। এর পর সমবেত বুদ্ধার্চনার পর শুরু হত ধর্মালোচনা। আঠারো দিনব্যাপী ধর্মানুষ্ঠান সংঘটিত হওয়ার পর হিউয়েন সাঙ মহাযান মতবাদকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেন। মহাযানী ও হীনযানীগণ তাঁকে যথাক্রমে 'মহাযানদেব' ও 'মোক্ষদেব' আখ্যায় ভূষিত করেন।

কনৌজের ধর্মসভা

হিউয়েন সাঙের উপস্থিতি

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

কনৌজের ধর্মসভার একুশ দিন পর প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হয় মহামোক্ষ মেলা। হিউয়েন সাঙের উপস্থিতিতে হর্ষবর্ধন পরপর তিনদিন সেখানে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ, সূর্য ও শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর শুরু হয় মুক্ত হস্তে দানধ্যান। প্রথমে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুকে স্বর্ণমুদ্রা, খাদ্য-পানীয়-বস্ত্র দান করা হয়। এর পর আসে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বিদেশ থেকে আগত ভিক্ষুদের পালা। শেষে একমাস ধরে হর্ষবর্ধন গরীব-দুঃখী, আর্ত-অনাথদের সর্বস্ব দান করতেন। বিগত পাঁচ বছরের সব সঞ্চয় এই ভাবে বিলিয়ে দিয়ে নিজের পরিধেয়টুকুও দান করে দিতেন। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে অতি সাধারণ, সামান্যতম বস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি মহামোক্ষ মেলা থেকে প্রস্থান করতেন। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে মোট ছ'বার এই মহামোক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াগের এই মেলাতে হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাঙকে প্রচুর ধনরত্ন নিবেদন করলেও তিনি এক ভিক্ষু হিসাবে তা গ্রহণ করতে অসম্মত হন। হর্ষবর্ধনের প্রয়াগে অবস্থানকালেই হিউয়েন সাঙ স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

প্রয়াগের মহামোক্ষ মেলা

আর্তসেবা ও দানধ্যান

সংস্কৃতিমনস্কতা

হর্ষবর্ধন নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উদারমনে সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ সাহিত্যসেবায় ব্যয় করা হত। নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি রচনা হর্ষবর্ধনের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকবি। ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর, মৌর্য ও ভর্তৃহরির মতো কবি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত জয়সেনকে হর্ষবর্ধন আশিটি গ্রাম দান করেছিলেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক

মূল্যায়ন

হর্ষবর্ধনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান বাণভট্টের হর্ষচরিত ও হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত। উভয়েই হর্ষবর্ধনকে এক দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা,

Scanned with CamScanner

সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্মে অনুরাগী এক মহান শাসক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার যুগে তিনি থানেশ্বর ও কনৌজ, দুটি রাজ্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতে এক সফল রাজশক্তি গঠনে সফল হন। রাজসিংহাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ফিরে আসে।

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তরভারতে সফলতম রাজশক্তি

হর্ষবর্ধন তাঁর রাজধানী হিসাবে কনৌজকে বেছে নেন। এই সময়ে পাটলিপুত্রের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে কনৌজের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার পাটলিপুত্রের মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি আমলা ও সেনাপতিদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিদানের ফলে বিকেন্দ্রিকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতার উৎস হিসাবে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির উত্থান ঘটে। কনৌজ এই শ্রেণীভুক্ত। সমতলভূমিতে অবস্থিত কোনো নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন ছিল। কিছুটা উচ্চস্থানে অবস্থিত কনৌজকে সহজেই সুরক্ষিত করা সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি ছিল দোয়াবের মধ্যাঞ্চলে, যেখান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা যায়। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে কনৌজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে ও হর্ষবর্ধনের শাসনকালে তার রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কনৌজ ক্রমে সর্বভারতীয় মর্যাদার অধিকারী হয়। 'মহোদয়শ্রী' (কনৌজের অপর নাম) অধিকার দূরবর্তী রাজন্যবর্গেরও কাম্য ছিল।

কনৌজ নগরের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি

৬০৬ খ্রীঃ-এ এক সংকটময় পরিস্থিতিতে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালব ও গৌড়ের জোটশক্তি তাঁর ভগ্নীপতি কনৌজরাজ গ্রহবর্মন ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করে। হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে পাল্টাজোট গঠন করে ভগ্নীকে উদ্ধার ও গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাস্ত করে কনৌজ দখল করেন। এই ঘটনা তাঁর সামরিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। চালুক্য আইহোল লিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরপথনাথ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। হিউয়েন সাঙের বিবরণে বলা হয়েছে তিনি 'পঞ্চভারত' অর্থাৎ পাঞ্জাব, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা ও কলিঙ্গ জয় করেন। কোনো কোনো ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধনকে 'হিন্দুযুগের শেষ সাম্রাজ্য সংগঠক' আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তাঁর মৃত্যু উত্তরভারতে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপনের সব চেষ্টার অবসান সূচনা করে। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক একই অভিমত পোষণ করেন।

মালব ও গৌড়ের বিরুদ্ধে পাল্টা সমরিক জোট

'শেষ সাম্রাজ্য-সংগঠক'

রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব ও অবদানকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন হর্ষবর্ধনের জীবনীকার বাণভট্ট ও একান্ত অনুগত ও গুণগ্রাহী হিউয়েন সাঙকে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, সাধারণত কোনো ঐতিহাসিক-ব্যক্তিত্ব ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু কখনও কখনও ইতিহাসও এই ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের লেখনীর দাক্ষিণ্যে হর্ষবর্ধন মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বিরুদ্ধেও তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। বলভীর মৈত্রকদের সঙ্গে তিনি মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য হন। প্রকৃত অর্থে তিনি কোনো সাম্রাজ্যই রেখে যাননি। তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেছিলেন কিন্তু গুপ্তরাজাদের মতো তার সংহতিবিধানে সফল হননি। কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি রেখে যাননি। তাঁর অধীনে থানেশ্বর ও কনৌজ ঐক্যবদ্ধ হলেও দুই রাষ্ট্রের অভিজাতবর্গ পরস্পরকে অবিশ্বাস করত। ফলে সুষ্ঠু শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সুসংহত আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। শিথিল ও অবিন্যস্ত সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভেঙে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব অতিরঞ্জিত

শিথিল সাম্রাজ্য

অযোগ্য উত্তরাধিকারী থানেশ্বর-কনৌজের সমন্বয়ের অভাব

Scanned with CamScanner

হর্ষবর্ধনকে হিন্দুযুগের 'শেষ সাম্রাজ্য সংগঠক' হিসাবে বর্ণনা করাকেও রমেশচন্দ্র মজুমদার 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তি' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পাঁচ শতাব্দী ধরে উত্তর ভারতে একাধিক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে যেগুলি আয়তন ও মর্যাদার দিক থেকে কনৌজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়। পাল ও রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের চেয়ে আয়তনে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। ললিতাদিত্যের কাশ্মীর ও যশোবর্মনের পরবর্তী কনৌজ সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের চেয়ে মর্যাদায় কোনো অংশে কম ছিল না। ভিনসেন্ট স্মিথ যখন হর্ষবর্ধন-পরবর্তী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে 'কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যের হতবুদ্ধিজনক কাহিনী' বলে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি দক্ষিণ ভারতকেও তাঁর পর্যবেক্ষণের মধ্যে ধরেছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট, পরবর্তী চালুক্য ও বিশাল চোল সাম্রাজ্যের উল্লেখ করে ভিনসেন্ট স্মিথের মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে পারি। হর্ষবর্ধনের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের সমরকুশলতা ও অশোকের প্রজাহিতৈষণার সমন্বয় ঘটেছে বলে রাধাকুমুদ মুখার্জি যে মন্তব্য করেছেন তাকেও অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়।

পাল-রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য কনৌজ সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী

ভিনসেন্ট স্মিথের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়

পরিশেষে বলা যায় হর্ষবর্ধনের শাসন কোনো মতেই ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নয় বা তা কোনো নতুন যুগের সূচনাও করেনি। ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব দীর্ঘদিন উত্তরভারতে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। রাজকার্য পরিচালনায় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার মনোভাব ও মানবতাবাদের যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরভারতকে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ না হলেও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর প্রভাবাধীন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা সমুদ্রগুপ্তের মতো বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে অসমর্থ হলেও গুপ্তোত্তর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে ও হূণ আক্রমণের কালে তিনি কিছুকাল অন্তত উত্তরভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

মূল অবদান-শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখা

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

উদার ধর্মমত

Scanned with CamScanner